বিপ্রলম্ভ

--- শ্রীল ভক্তিবিবুধ বোধায়ন গোস্বামী মহারাজ

শাস্ত্র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিত্য ও তাঁর শুদ্ধভক্তগণও নিত্য। কিন্তু এক মানব রূপী শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের ন্যায় কিভাবে নিত্য হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে স্বভাবতঃ আমাদের নিকট এই উত্তর ভেসে আসে--শুদ্ধ ভক্তগণ ভগবানের আদেশ অনুযায়ী নিজ জীবনকে চালনা করেন, আর যা কিছু তাঁহারা বলেন সমস্ত বিষয়ই ভগবানের মনের ইচ্ছার বহিঃ প্রকাশ করেন মাত্র। এজন্য আমরা অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি এই দুর্ল্লভ মানব জীবনটাকে ভক্তিময় করতে ইচ্ছুক, তাঁদের উচিৎ নিজ নিজ মন-কল্পিত শাস্ত্র বিরুদ্ধ বাঞ্ছা পরিত্যাগ করে, শুধুমাত্র শুদ্ধভক্ত স্বরূপ দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুগণের আদেশ নির্দেশানুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিচালনা করা। এজগতের মানুষগণ শুদ্ধভক্তের পদাঙ্কানুশরণ ছেড়ে যতই নিজেদের স্বতন্ত্রতাকে প্রশ্রয় দেবে, ততই সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

নিষ্কপট্ শরণাগত ব্যক্তিগণকেই ভগবান কৃপা করেন। শ্রীভগবান যাঁহাকে কৃপা করেন, তাঁদের কখনই ভৌতিক দ্রব্য হারানোর ভয় থাকতে পারে না। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা পাবার প্রবল ইচ্ছাকেই মারাত্মক ভৌতিক দ্রব্য বলে শুদ্ধভক্তি সমাজে গণ্য করা হয়েছে। এই লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার পেছনে আমরা যতই আসক্ত হব, ঠিক ততটাই আমাদের মন সংশয়ে ভুগবে এবং ক্রমে ভগবান ও তৎশুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ হতে তফাৎ হয়ে যাব। এই শুদ্ধভক্ত স্বরূপ গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ হতে আমরা যতটা তফাৎ হব, এই ভৌতিক জগতের ভয় আমাদেরকে ততটাই পীড়া দিতে থাকবে।

এই পৃথিবীতে মানুষ দেহ নিয়ে জন্ম নেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হল--ভৌতিক লোভ-লালসা হতে মুক্ত হয়ে, প্রীতিভরে ভগবানের সেবা করা। এই ধরণের সেবা বৃত্তিই হল প্রত্যেক জীবের নিত্য স্বরূপ। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধভক্তের পদাঙ্কানুশরণে এই সেবা করতে পারলেই মানুষ দেহ ধারণের স্বার্থকতা হবে।

শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর সমগ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যান্য শুদ্ধ ভক্তগণের মধ্যে একজন অন্যতম। যিনি তাঁর সমগ্র জীবন দ্বারা আমাদেরকে আচরণ মুখে শ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভুর রচিত শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকের মূর্ত্ত-বিগ্রহ হবার শিক্ষা দিয়েছেন। অর্থাৎ শ্লোকার্থ অনুযায়ী নিজ জীবনকে চালনা করে সমগ্র জগৎকে শিক্ষা দিলেন--এই কলহ প্রবণ কপট কলিযুগেও গুরু-বৈষ্ণব ভগবানের কৃপায় আমরা

আমাদের আচরণে দৈন্যতা, সহিষ্ণুতা, জড় লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা রহিত হয়ে এবং সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করেও শান্তিপূর্ণ মনে হরিনাম গ্রহণের দ্বারা আনায়াসে স্বর্গে অবস্থানকারী দেব-দেবীর পক্ষে যা প্রাপ্ত হওয়া দুর্ল্লভ সেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে সমর্থ।

শ্রীল গুরুদেবের বিরহ তিথির সময় কালীন প্রকাশিত এই ভাগবত-ধর্ম পত্রিকাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পারমার্থিক উন্নতি বিধানের মাপকাঠি-বিরহ উপলব্ধির গুরুত্বকে অবজ্ঞা করা উচিৎ হবে না। এই জন্য সমগ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী দ্বারা উল্লিখিত তিনজনের বিরহ উপলব্ধির সঙ্গে অন্যান্য আচার্য্যের বিরহ সমানতো নয়ই; বরং গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই তিনজনের বিরহ আস্বাদনের জন্য নিত্য লালায়িত।

সর্বপ্রথম এই বিরহের প্রকাশ ঘটেছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হতে অভিন্ন আনন্দ-দায়িনি শক্তি স্বরূপা শ্রীমতি রাধারাণীর মধ্যে। এক সময় শ্রীকৃষ্ণ, জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা বলরামকে নিয়ে নিজের মামা কংস দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে রথে চড়ে বৃন্দাবন হতে মথুরা যাচ্ছেন এমন সময় রাধারাণী অন্যান্য সখী দ্বারা রথের গমন পথ বন্ধ করে নিজেদের বিরহের প্রাথমিক প্রকাশ দেখিয়েছিলেন। এই সময় রাধারাণী সহ অন্যান্য সখীগণকে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অচিরেই বৃন্দাবন প্রত্যাবর্ত্তন করবেন। বহুকাল অতিক্রান্ত হল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বৃন্দাবনে পুনঃ আগমন ঘটল না। এই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন ও সঙ্গ জনিত বিরহে রাধারাণী বিলাপ করতে গিয়ে বললেন--

অয়ি দীন দয়ার্দ্র নাথ! হে মথুরানাথ! কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।।"

অর্থাৎ হে পতিত জীবের উদ্ধার বা ত্রাণ কর্ত্তা তুমি আজ আমার নিকট বৃন্দাবন নাথ হতে মথুরানাথ হলে। শ্রীকৃষ্ণ সর্বক্ষণ হৃদয়ের অন্তকরণ হতে বৃন্দাবনেই থাকেন কিন্তু বিরহ বেদনায় পীড়িত হয়ে রাধারাণী বললেন--তুমি মথুরানাথ! কিন্তু পরক্ষণেই বল্লেন--আমার হৃদয় তোমার সাক্ষাৎ সেবা লাভের নিমিত্ত ছট্‌ফট্ করছে। এই ধরণের অন্তরের গভীর ভালবাসা ও বাহ্যে ক্রোধের প্রকাশ এর ভাবকে বলা হয় 'মান'। এই মান এর বশবর্ত্তী হয়ে রাধারাণী পুনঃ বললেন--"হে প্রিয়তম তুমি বল তোমার সেবা ছেড়ে আমি কি করব"?

শ্রীমতিরাধারাণীর এই চরম বিরহ প্রকাশ দেখে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ আমাদের সকলকে অবগত করালেন--

এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা-ঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র-বাণী।।
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠজন।। চৈঃ চঃ

উপরিলিখিত পয়ার দ্বয়কে বিচার করলে আমরা বুঝতে পারব-- রাধারাণী সর্বপ্রথম এই 'দীন-দয়াদ্রনাথ' বিরহ প্রকাশের চরম শ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করানোর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। রাধারাণীর পরবর্ত্তীকালে এই বিরহের চরম শ্লোকার্থ আস্বাদন করেছিলেন অদ্বৈত্য আচার্য্য ও ঈশ্বরপুরীপাদ দ্বয়গণের গৌরবের পাত্র, প্রেমের আচার্য্য-মাধবেন্দ্রপুরী পাদ। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের পরবর্ত্তীকালে– শ্রীমতিরাধারাণীর ভাব-কান্তি সুবলিত শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যময় মূর্ত্তি কলিযুগ পাবনাবতারী নদীয়া বাসীর প্রাণনাথ শচীনন্দন গৌরহরি এই চরম শ্লোকার্থের আস্বাদন করেছিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পরিশেষে বললেন--এই তিন জন ছাড়া এখনও পর্যন্ত এই বিরহ আস্বাদনকারী চতুর্থজনকে বৈষ্ণব সমাজে দেখা যাচ্ছে না। আমাদের পারমার্থিক মূল লক্ষ্য

এই বিরহের এক বিন্দু নিজের জীবনে আস্বাদন করা। হৃদয়েতে এই বিরহ উপলব্ধির নাম 'বিপ্রলম্ভ'। এই বিপ্রলম্ভ রস আস্বাদন করার জন্য আমাদেরকে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবায় নিষ্কপট হয়ে আত্মনিবেদন করা প্রয়োজন। এইজন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদেরকে তাঁর এক লেখনীর দ্বারা জানালেন--

আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি, হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল, চৌদিকে আনন্দ দেখি।।

বিপ্রলম্ভ রসের এই এক বিন্দু আস্বাদনের জন্য আমাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন গুরু চরণে অকৃত্রিম আনুগত্য স্বীকার ও ভগবানের কৃপা এই দুই-এর সমন্বয়। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে ভগবানের কৃপা ভগবানেরই শুদ্ধ ভক্তের মাধ্যমে আমাদের নিকট বর্ষিত হয়। এই জন্য পরমার্থ অর্জন লোভী প্রত্যেকের উচিৎ তাঁদের হৃদয়ের অন্তকরণ হতে গুরু-বৈষ্ণবগণের সেবায় পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন করে এই দুর্ল্লভ মানব জীবনকে আনন্দময় করা।